স্থানীয় সরকার

রাজনৈতিক প্রশাসনিক দুর্বৃত্তায়নের শিকার

রিপোর্ট : **সাইফুল হাসান**

আবুল হোসেন, বাড়ি শৈলকুপা থানার পাইকপাড়া গ্রামে। প্রায় ৩০ বছর ইউপি মেম্বার ছিলেন। আশপাশের ১৫ গ্রামে তার খ্যাতি ছিলো। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতাবিরোধীরা তাকে হত্যা করে। আবুল হোসেনের মৃত্যুর পর গ্রামটি নেতৃত্বশূন্য হয়ে পড়ে। সম্ভবত ১৯৮৭ সালের ইউপি নির্বাচনের গ্রামবাসীসহ আশপাশের কয়েক গ্রামের লোক মেজ ছেলে মনোয়ার হোসেনকে ধরলো নির্বাচনে দাঁড়াতে। এই পরিবার আর নির্বাচনে যেতে চায় না। কিন্তু জনগণের অনুরোধ, আবদার উপেক্ষা করার মতো অবস্থা ছিল না। কারণ আবুল হোসেন বিশ্বাসের মৃত্যুর পরও গ্রামের অভিভাবক বা নেতৃত্বে ছিল এই পরিবার। এলাকাবাসী মনোয়ার হোসেনের হয়ে নমিনেশন জমা দিল। নির্বাচনের জন্য খরচও খুব একটা করতে হয়নি। সত্যি বলতে, নির্বাচনের ক্যাম্পেইনেই তিনি খুব একটা মনোনিবেশ করেননি। নির্বাচন হলো, দেখা গেলো পিতার প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তিনি সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে ১ম মেম্বার হয়েছেন। তার সঙ্গে আরও দু'জন নির্বাচিত হলেন। যাদের সামাজিক বা পারিবারিক পরিচয় উল্লেখ করার মতো কিছু ছিল না।

পাঁচ বছর পর আবার নির্বাচন। কিন্তু প্রার্থী হিসেবে মনোয়ার হোসেনের নাম শোনা যাচ্ছে না। কারণ নির্বাচন করার মতো আর্থিক ও মানসিক অবস্থা তার নেই। বাবার সুনাম আর এলাকার লোকজনের অভাব-অভিযোগ রক্ষা করতে গিয়ে তিনি সর্বস্বান্ত। পৈতৃক জমি সব বিক্রি তো করেছেনই, সেই সঙ্গে অন্য ভাইবোনের জমিও বন্ধক রেখেছেন। তিনি সর্বস্বান্ত হলেও তার সঙ্গে জেতা অন্য দুই মেম্বারের অবস্থা ফিরেছে। তাদের মোটরসাইকেল হয়েছে, মাঠে জমি হয়েছে, বাড়িতে পাকা ঘর উঠেছে। সর্বোপরি তারা নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। এক সময় দেখা গেলো মনোয়ার হোসেনের সন্তানরা অন্যের বাড়িতে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। তার সততাকে সম্মান জানালেও সব সম্পত্তি বেঁচে জনসেবা করার যুক্তিকে সমর্থন করি না। মনোয়ার হোসেনের মতো অনেক মেম্বার-চেয়ারম্যান সারা দেশে ছড়িয়ে আছে। যারা চারিত্রিকভাবে সৎ এবং সত্যি কাজ করতে চায়-এটা যেমন বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারে একটি চিত্র, বিপরীত একটি চিত্রও আছে।

চট্টগ্রাম অঞ্চলের আহমইদ্যা, জামাল উদ্দিন অপহরণ মামলার প্রধান আসামি শহীদ চেয়ারম্যান, আন্তর্জাতিক অস্ত্র ব্যবসায়ী কাশেম চেয়ারম্যান, কুষ্টিয়ার বারিক মেম্বারসহ আরও অনেক স্থানীয় সরকার প্রতিনিধির নাম বলা যায় যারা সন্ত্রাস, রাহাজানিসহ নানা প্রকার অপকর্মের সঙ্গে জড়িত। একটা কথা চালু আছে, ইউপি চেয়ারম্যান-মেম্বার মানেই স্থানীয় সবচেয়ে খারাপ লোক। যদিও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে কি পরিমাণ সদস্য থানার তালিকাভুক্ত আসামি বা খারাপ রেকর্ডের অধিকারী তার কোনো স্টাডি নেই। সারা দেশের চিত্র কাশেম চেয়ারম্যানদের মতো নয় বলে দাবি করেছেন স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু সাধারণ মানুষের ধারণা, স্বাধীনতা-উত্তর দেশে স্থানীয় সরকারে দুর্বৃত্তায়ন ঘটেছে আশঙ্কাজনকহারে। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, দুর্বৃত্তায়ন যতটা ঘটেছে তারচেয়ে অনেক বেশি দুর্বৃত্তদের কবলে আছে স্থানীয় সরকার। যে কারণে এই প্রতিষ্ঠানটি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে না।

রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নে স্থানীয় সরকার

গণতন্ত্রকে সচল এবং কার্যকর করতে হলে স্থানীয় সরকারকে কার্যকর করার বিকল্প নেই। বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা হচ্ছে, তিন দশকে স্থানীয় সরকারকে অচল করে ফেলার রাজনীতি জাতীয় পর্যায়ে হয়েছে, এখনো হচ্ছে। শুধু স্থানীয় সরকারে দুর্বৃত্তায়ন ঘটেছে তা নয়, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন রাষ্ট্রের সকল পর্যায়ে হয়েছে। অন্যান্য ক্ষেত্রের কথা বলা না হলে স্থানীয় সরকারের প্রতি অন্যায় করা হবে।

আইয়ুব খানের শাসনামলে ইউপি সদস্যদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। তখন গ্রামের সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্যরা ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃত্বে আসতো। সে সময় প্রেসিডেন্টসিয়াল পদ্ধতিতে ইউপি চেয়ারম্যানরা শুধু ভোট দিতে পারতো। আইয়ুব খান তার ক্ষমতাকে পোক্ত করতে এবং ভোট পাবার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে ভালো অনুদানও দিতো। যে কারণে সে সময় স্থানীয় পর্যায়ে ভালো কাজ হয়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা জানান। এসব নেতৃত্ব ভালো কাজ যেমন করেছে তেমনি জনগণের জন্য আনা অনুদানও মেরে খেয়েছে। ১৯৬৮ সালে অধ্যাপক রেহমান সোবহান তার Basic democracy work programme and Rural Development in east Pakistan নামক একটি গ্রন্থে দেখান, আইয়ুব সরকারের আমলে তৎকালীন ইউপি সদস্যরা কিভাবে সরকারি অনুদান মেরে খেয়েছে। মূলত এরপর থেকেই ইউপি সদস্যরা গমচোর খেতাবে ভূষিত হতে থাকে। যদিও এ চিত্র নিয়ে দ্বিমত রয়েছে। ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার, স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞসহ বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ইউপি সদস্যরা যতটা দুর্বৃত্তে পরিণত হয়েছে, তারচেয়ে অনেক বেশি পরিস্থিতির শিকার তারা।

জাতীয় রাজনীতির ধারকবাহক অনেকেই অর্থ, অস্ত্র আর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার জোরে এসব নেতৃত্বকে সামনে নিয়ে আসে। আবার স্থানীয় পর্যায়ে যেসব নেতৃত্ব কাজ করতে চান তাদের জন্যও নানারকম রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বাধা রয়েছে। সংবিধান অনুসারে স্থানীয় সরকার কাঠামো স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত হবার কথা। দুঃখজনক হলো, তাদের স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন ভোগ করার কোনো সুযোগ নেই। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক ড. তোফায়েল আহমেদ বলেন, 'স্থানীয় সরকার প্রশাসন, এমপি বা রাজনীতিক ও থানা পুলিশের ক্রসফায়ারের ঝুঁকির মধ্যে থাকে। এই ঝুঁকি অতিক্রম করে তাদের জন্য কাজ করা সত্যিই কঠিন। তারা সবচেয়ে বিপদের মধ্যে থাকে রাজনীতিবিদদের নিয়ে। কারণ স্থানীয় এমপির নির্দেশের বাইরে তারা কোনো কাজ করতে পারে না। আর ইউপি চেয়ারম্যান যদি এমপির মতাদর্শের বিরোধী হয় তাহলে তো কথাই নেই। সুতরাং স্থানীয় সরকারে কেউ যদি দুর্বৃত্তে পরিণত হয়, তার জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী রাজনীতি।' বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. আতিউর রহমান বলেন, 'গত ২০ বছর স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করার কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি। আগে আমলারা তাদের দমিয়ে রাখার চেষ্টা করতো, এখন এমপিদের স্থানীয় সরকারের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলা হয়েছে। উপজেলা ও জেলা পরিষদ তো দাঁড়াতেই পারলো না। আপনি কারও হাত-পা বেঁধে রেখে তার কাছ থেকে কিছু আশা করতে পারেন না।' কেন্দ্রীয় সরকারে গণতন্ত্র চালু হওয়ায় তাদের লোকজনকে স্থানীয় লোকজনের

ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। ফলে এমিপরা তাদের মূল দায়িত্ব থেকে সরে এসে উন্নয়ন কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ছে। এতে করে রাজনীতিবিদরা অন্যের টেরিটোরিতে প্রবেশ করছে।

ড. আমিরুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, 'স্থানীয় সরকার করা হয়েছে স্থানীয় কিছু সার্ভিস দেবার জন্য। কারণ সরকার হিসেবে ইউপি মেম্বার-চেয়ারম্যানরা জনগণের কাছে থাকে। কিন্তু আমলা আর রাজনীতিবিদরা মিলে এমন একটি সিস্টেমে দাঁড় করিয়েছে, যাতে চেয়ারম্যানরা এমপিদের কথা শুনতে বাধ্য। আবার এমপিদের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলে তারা কেন্দ্রীয় অনুদান থেকে বঞ্চিত হয়। এটা একটা জটিল সমস্যা।'

নিয়ম অনুযায়ী ইউপি নির্বাচন অরাজনৈতিক হবার কথা থাকলেও বাস্তবে তা ঘটছে না। যদিও নির্বাচনে এখন পর্যন্ত রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতীক ব্যবহার হয় না। ড. সালাহউদ্দিন আমিনুজ্জামান বলেন, 'আমরা একটা স্টাডিতে দেখেছি ইউপি নির্বাচনে জাতীয় দলগুলোর প্রতীক ব্যবহার না হলেও ৯২ শতাংশ নমিনেশন হয় রাজনৈতিকভাবে।' এরশাদের পতনের পর গণতান্ত্রিক চর্চা বাংলাদেশের রাজনীতিতে চালু হলেও দেশ প্রকটভাবে বিভক্ত। এই বিভক্তি ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে সামাজিক গন্ডি পর্যন্ত বিস্তৃত। এই বিভক্তি স্থানীয় সরকার কাঠামোর ওপর প্রতিনিয়ত যেমন চাপ সৃষ্টি করছে, তেমনি ইউপি সদস্যদের নেতৃত্ব বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ ফোরামের কেন্দ্রীয় সভাপতি চেয়ারম্যান গোলাম সরোয়ার বলেন, 'আগে চেয়ারম্যানদের রাজনৈতিক বিবেচনায় আনা হতো না, দলমত নির্বিশেষে স্থানীয় উন্নয়নের কাজে অংশগ্রহণ করতে পারতো। এখন আমাদের রাজনৈতিকভাবে বিবেচনা করা হচ্ছে। এতে স্থানীয় পর্যায়ে এমপিদের হস্তক্ষেপ বাড়ছে, সরকারি খবরদারি জেঁকে বসেছে আমাদের ওপর।'

গত তিন দশকে জাতীয় রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। একই সঙ্গে রাজনীতিতে কালো টাকা, পেশিশক্তি ব্যবসায়ীদের উত্থান ঘটেছে। এর সবচেয়ে বড় শিকার স্থানীয় সরকার। এখান থেকে উত্তরণের জন্য চেয়ারম্যান-মেম্বাররা চেষ্টা করলেও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তদের হাত থেকে মুক্তি পাচ্ছে না। এ বিষয়ে ইদানীং কিছু কাজ শুরু হলেও স্থানীয় সরকার একটি দুর্বৃত্তায়নের পাকচক্রে ঘুরপাক খাচ্ছে।

মন্ত্রণালয়ের সার্কুলার স্থানীয় সরকারে প্রধান বাধা

স্থানীয় সরকার পরিচালনার জন্য যেসব আইন আছে তার সবই ব্রিটিশ আমলের। স্বাধীনতার পর সামরিক শাসনের সময় ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যরা ক্ষমতা ও অনুদান ভোগ করেছে। সামরিক শাসন শেষ হয়েছে দেড় দশক, গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় আসা-যাওয়া করছে। কিন্তু আইনের তেমন কোনো পরিবর্তন নেই। কেন? স্থানীয় সরকারের অধিকাংশ আইন ব্রিটিশ আমলের। কলোনাইজ আমলের আইনকে বদলানো হয়নি। পাকিস্তানের শাসনও সেমি কলোনাইজ। স্বাধীনতা-উত্তর দেশে প্রশাসনিক কাঠামো বিবেচনা করা হয়েছে। এ নিয়ম অনুযায়ী প্রশাসন একজন নির্বাচিত ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত হবে। কিন্তু তা হচ্ছে কোথায়? জেলা ও উপজেলা পরিষদে দীর্ঘদিন নির্বাচন বন্ধ। এমপিরা চান না উপজেলা নির্বাচন হোক। কারণ তাদের ক্ষমতা খর্ব হবে। স্থানীয় সরকারবিষয়ক আইনগুলো পরিষ্কার নয় বলেই তারা এ সুযোগটা নেন।

আইন নিয়ে আলোচনা এ কারণে যে, স্থানীয় সরকারকে মন্ত্রণালয়ের সার্কুলার আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। মন্ত্রণালয় থেকে আজ এই সার্কুলার তো কাল আরেকটি। স্থানীয় সরকার নিয়ে যারা কাজ করেন তারা মন্ত্রণালয়ের সার্কুলারকে নেতৃত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হিসেবে অভিহিত করেন।

সার্কুলার নিয়ে প্রচুর আলোচনা-সমালোচনা হলেও মন্ত্রণালয় এখান থেকে সরে আসেনি। ড. আতিউর রহমান বলেন, 'সার্কুলারের রাজত্বের অবসান হওয়া দরকার। মন্ত্রণালয়ের সার্কুলার হলো আমলাতান্ত্রিক একটি প্রক্রিয়া। গণতন্ত্রে এটি খারাপ চর্চা। সার্কুলার জারি করে চেয়ারম্যান-মেম্বারদের ক্ষমতা খর্ব করার প্র্যাকটিস আইন করে বন্ধ করা উচিত।'

সার্কুলারের ক্ষেত্রে সরকারি পক্ষেরও একটা যুক্তি অবশ্য আছে। সেটা হলো, উন্নয়নশীল দেশ বলেই স্থানীয় সরকারে মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন আছে। ড. তোফায়েল আহমেদ আবার এই যুক্তির সঙ্গে একমত নন। তিনি বলেন, 'স্থানীয় সরকারকে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিকভাবে জড়িয়ে ফেলায় তারা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে না। সার্কুলারের মতো আমলতান্ত্রিক, অগণতান্ত্রিক চর্চার ফলে তারা যেমন দুর্নীতির দিকে ধাবিত হচ্ছে, তেমনি সরকার স্থানীয় সরকারের ওপর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করছে।' জাতীয় ইউনিয়ন পরিষদ ফোরামের সভাপতি গোলাম সরোয়ার বলেন, 'স্থানীয় সরকারের স্বায়ত্তশাসন বিরোধী মন্ত্রণালয়ের সার্কুলার আমরা বন্ধ করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছি। সরকার আন্তরিক হলে ইউনিয়ন পরিষদ অবশ্যই সফল হবে। কিন্তু সরকার বা মন্ত্রণালয় সেটা চায় না। সার্কুলারের কারণে ইউপি চেয়ারম্যানদের ওপর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দুর্নীতি চেপে বসছে।' জানিপপের চেয়ারম্যান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নাজমুল ইসলাম কলিমুল্লাহ বলেন, 'স্থানীয় সরকার অ্যাক্টের সংস্কার করতে হবে। সময়োপযোগী ও আধুনিক অ্যাক্ট যতদিন পর্যন্ত করা সম্ভব হচ্ছে না ততদিন পর্যন্ত মন্ত্রণালয়ের সার্কুলার বন্ধ করা সম্ভব হবে না। সার্কুলার বন্ধের ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রধান প্রতিবন্ধকতা হবে মন্ত্রণালয়। কিন্তু স্থানীয় উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে হলে অবশ্যই এখান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।'

রাষ্ট্র যদি হয় একটি শরীর, তবে স্থানীয় সরকার হলো এর প্রাণ। স্থানীয় সরকার শক্তিশালী হলে গণতন্ত্র শক্তিশালী হবে। জবাবদিহিতা বাড়বে। পাশাপাশি শহর ও গ্রামীণ জীবনের মধ্যে যে বৈষম্য, সেটাও কমে আসবে। একই সঙ্গে সারা দেশ থেকে আগামী দিনের নেতৃত্ব উঠে আসবে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, অনেক সময় এমন সব সার্কুলার জারি করা হয়, যেগুলো সংবিধান এমনকি প্রচলিত সকল আইন বিরোধী। সার্কুলার জারির আগে চেয়ারম্যানদের সঙ্গে আলোচনাও হয় না। ড. আমিরুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, 'আইন পরিবর্তন না করে সার্কুলার জারি করা উচিত নয়। চেয়ারম্যান-মেম্বারদের গ্রহণ করাও উচিত না।' স্থানীয় পর্যায়ে যারা নির্বাচিত হন তারাও একটি সরকার। জনগণের সুখে-দুঃখে তারাই সব সময় পাশে থাকে। স্থানীয় নেতৃত্ব ছাড়া আর কোথাও জনগণের ঐ অর্থে প্রবেশাধিকার নেই। যে সরকার জনগণের কাছাকাছি থাকে, তাকে সার্কুলারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করার অপচেষ্টা কি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য?

দুর্বৃত্তায়ন বন্ধে প্রয়োজন ক্ষমতা ও অর্থ

ইউপি চেয়ারম্যান-মেম্বারদের অবস্থা অনেকটা নিধিরাম সর্দারের মতো। জনগণ তাকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করে কিন্তু তার কোনো ক্ষমতা নেই। যে ইউপি চেয়ারম্যানের ক্ষমতা খর্ব করে তাকে জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। কোন গ্রামের কোন রাস্তা হবে তার জন্য ঢাকায় বসে মাথা ঘামাতে হয় স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়কে। তা কেন হবে? কোন গ্রামে কোন রাস্তা হওয়া উচিত সেটার জন্য তো মেম্বার বা চেয়ারম্যানই যথেষ্ট। তারপরও মন্ত্রণালয় মাথা ঘামায় কারণ তাদের ক্ষমতা দেখানো ও ভাগবাটোয়ারোর জন্য এটা করা প্রয়োজন।

গ্রামবাসী ভোট দিয়ে চেয়ারম্যান বা মেম্বারকে নির্বাচিত করে, তাদের কাছে এরা ক্ষমতাবান ব্যক্তি। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ক্ষমতাবানই হবার কথা। কিন্তু তা হয় না, স্থানীয় আমলা আর এমপি সব ক্ষমতা একাই ভোগ করে। একজন চেয়ারম্যানের

কোন গ্রামের কোন রাস্তা হবে তার জন্য ঢাকায় বসে মাথা ঘামাতে হয় স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়কে। তা কেন হবে? কোন গ্রামে কোন রাস্তা হওয়া উচিত সেটার জন্য তো মেম্বার বা চেয়ারম্যানই যথেষ্ট। তারপরও মন্ত্রণালয় মাথা ঘামায় কারণ তাদের ক্ষমতা দেখানো ও ভাগবাটোয়ারোর জন্য এটা করা প্রয়োজন।

মাসিক ভাতা ৫০০ টাকা, মেম্বারের ৩৫০ টাকা। আজকের এই যুগে ৫০০ টাকা একজন জনপ্রতিনিধির ভাতা হতে পারে! কি আশ্চর্য! কিন্তু যারা সংসদে আসেন? তাদের দিকে তাকালেই বোঝা যায় রাষ্ট্রীয়ভাবে স্থানীয় সরকারের প্রতি বৈষম্য কতটা প্রকট। নির্বাচিত হয়ে আসার পর একজন এমপির জন্য লাল পাসপোর্ট, গাড়ি, বাড়িসহ মাসিক ভাতার পরিমাণটা বিশাল। তাছাড়া হাজার রকম রাষ্ট্রীয় সুযোগের পথ তার সামনে উন্মুক্ত হয়। এমপি যদি সরকারি দলের হন তাহলে তো কথাই নেই। পুরো দেশকে তারা নিজেদের সম্পত্তি মনে করেন।

রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের জন্য কাউকে কাজে লাগাতে হলে তাদের জন্য সম্মানজনক ভাতার ব্যবস্থা করা জরুরি। যদি কাজের কোনো স্বীকৃতি না থাকে তবে এক সময় মানুষ নিরুৎসাহী হতে বাধ্য। এমপিদের জন্য থোক বরাদ্দের ব্যবস্থা থাকলেও ইউপি সদস্যদের জন্য কোনো ব্যবস্থা নেই। এক হিসাবে দেখা যায়, জিয়াউর রহমানের শাসনামলে উন্নয়ন বাজেটের ২৫ শতাংশ ব্যয় হতো স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে। ছাত্তারের সময় ১৩ শতাংশ ও এরশাদের সময় সেটা মাত্র ৮ শতাংশে এসে দাঁড়ায়। তার পরের অবস্থা তো আরও করুণ। হাসিনা সরকারের সময় এ দিকটায় নজর দেয়া হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। জানা গেছে, এখন উন্নয়ন বাজেটের ৯.৯ শতাংশ স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে ব্যয় করা হয়। অন্য আরেকটি স্টাডিতে দেখা যায়, যখন সামরিক সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন সত্যিকার অর্থেই স্থানীয় সরকার ক্ষমতা ও উন্নয়ন বরাদ্দ ভোগ করতো। সামরিক শাসকদের উদ্দেশ্য ক্ষমতাকে পোক্ত করা হলেও এ সময়ে গ্রামীণ কাঠামোর উন্নয়নের ছাপ চোখে পড়ার মতো।

অনুসন্ধানে জানা যায়, বর্তমানে বছরে মাত্র ৬ লাখ টাকার মতো ইউনিয়ন পরিষদে যায়। এই টাকা পেতেও চেয়ারম্যানদের হিমশিম খেতে হয়। এমপি, থানা নির্বাহী অফিসার, ইঞ্জিনিয়ারদের পার্সেন্টেজ দেবার পর যখন টাকা চেয়ারম্যানের হাতে আসে, তখন আর কাজ করার শক্তি তাদের থাকে না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ইউপি চেয়ারম্যান সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'কি বলবো ভাই! জনগণের জন্য কাজ করতে এসে কি বিপদেই না পড়েছি। বছরে ৬ লাখ টাকার মতো বরাদ্দ আসে। এই টাকা হাতে পাবার জন্য এতো ঘুরতে হয় যে, এক সময় কাজ করার মানসিকতা থাকে না। পার্সেন্টেজ দেবার পর যে টাকা হাতে আসে তা দিয়ে প্রজেক্ট হয় না। আবার কাজ শুরু করার পর মাস্তান, রাজনৈতিক নেতাদের ভাগবাটোয়ারা তো থাকেই।'

জানা গেছে, বর্তমান সরকার ইউনিয়নপ্রতি ২ লাখ টাকা থোক বরাদ্দ দেবার চিন্তা করছে। এই টাকা সরাসরি ইউনিয়ন পরিষদের একাউন্টে জমা হবে। এটি অবশ্যই ভালো উদ্যোগ। কিন্তু উন্নয়ন বরাদ্দ আরও অনেক বেশি স্থানীয় সরকারের হাতে ছেড়ে দেয়া উচিত। ড. আতিউর রহমান বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার তো বার্ষিক বাজেট পায়। কিন্তু স্থানীয় সরকারের জন্য কোনো টাকা বরাদ্দ থাকে না। তাহলে রাষ্ট্রের উন্নয়ন হবে কিভাবে?'

ভারত বিশাল দেশ। দারিদ্র্য আমাদের মতো তাদের জন্যও মাথাব্যথার কারণ। কিন্তু তারা দিন দিন এগিয়ে যাচ্ছে আর আমরা পিছিয়ে পড়ছি। ভারতে মোট উন্নয়ন বাজেটের ৪০ শতাংশ, ফিলিপাইনে ৪২ শতাংশ স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে ব্যয় হয়। যে কারণে তাদের স্থানীয় সরকার কাঠামো যেমন শক্তিশালী তেমনি গণতান্ত্রিক চর্চাও রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিকশিত হচ্ছে। জাতীয় ইউনিয়ন পরিষদ ফোরামের সভাপতি গোলাম সরোয়ার বলেন, 'আমরা কাজ করতে চাই। জনগণের সেবা করার মানসিকতা নিয়েই ইউনিয়ন পরিষদে এসেছি। কিন্তু কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। আমরা স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে ১২ দফা দাবি পেশ করেছি। উন্নয়ন বাজেটের ২৫ শতাংশ স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে ব্যয় করার দাবি জানিয়েছি। সেই সঙ্গে বেতন-ভাতা বাড়াতে হবে। থোক বরাদ্দ দিক সরকার, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূর করুক- দেখেন কয়েক বছরের মধ্যে দেশের অবস্থা কি দাঁড়ায়। দেশের যদি উন্নয়ন করতে চান তাহলে আপনাকে এগুলো করতেই হবে।' জানিপপের চেয়ারম্যান নাজমুল ইসলাম কলিমুল্লাহ বলেন, 'স্থানীয় সরকারকে দিয়ে কাজ করাতে হলে তাদের সম্মানী ও স্ট্যাটাস দিতেই হবে।' হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, 'স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করার কোনো ইচ্ছা সরকারের নাই। তারা একমাত্র নিজেদের ক্ষমতা ব্যবহারের ব্যাপারে চিন্তিত। এর ফাঁকে ফাঁকে যতটুকু সম্ভব স্থানীয় সরকার আগাচ্ছে। এটাই আশার কথা।'

রাষ্ট্র যদি হয় একটি শরীর, তবে স্থানীয় সরকার হলো এর প্রাণ। স্থানীয় সরকার শক্তিশালী হলে গণতন্ত্র শক্তিশালী হবে। জবাবদিহিতা বাড়বে। পাশাপাশি শহর ও গ্রামীণ জীবনের মধ্যে যে বৈষম্য, সেটাও কমে আসবে। একই সঙ্গে সারা দেশ থেকে আগামী দিনের নেতৃত্ব উঠে আসবে। এতো সব সম্ভাবনাকে যদি একসঙ্গে বিকশিত হবার সুযোগ দেয়া যায়, তবেই না দেশ মাথা তুলে দাঁড়াবে।

ইমেজ সংকটে স্থানীয় সরকার

সাফল্যের ক্ষেত্রে ইমেজ একটা বড় ফ্যাক্টর। বলা ভালো গত ৩ দশক ধরেই স্থানীয় সরকারের ইমেজ ধ্বংস করার কাজটি সুকৌশলে চলে আসছে। গম চোর, সন্ত্রাসী, খারাপ লোক- এই চিত্রটিই ইউপি সদস্যদের কথা মনে হলে ভেসে ওঠে। প্রশ্ন হচ্ছে, ৪ হাজার ৫০০ ইউনিয়ন পরিষদের সবাই কি খারাপ? সবাই কি লুটতরাজ, রাহাজানি, বদমায়েশির সঙ্গে জড়িত? স্থানীয় সরকার নিয়ে যারা কাজ করেন তারা কি বলেন?

ড. সালাহউদ্দিন আমিনুজ্জামান বলেন, 'এটা খুব খারাপ দৃষ্টান্ত যে, সব ইউপি সদস্যকে চোর বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। এ কাজটা করেছে মিড লেভেলের আমলারা। পরবর্তীতে তাদের সঙ্গে যোগ দেয় রাজনৈতিক দুর্বৃত্তরা। অথচ ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের চোর হতে সাহায্য করে এরাই। কারণ তারা এমন সিস্টেম করে রেখেছে যে, ইউপি চেয়ারম্যানের দুর্নীতি না করে কোনো উপায় থাকে না। তাদের দুর্নীতির সবচেয়ে বেশি অংশ ভোগ করে আমলারা। কিন্তু তারাই ৩০ বছর ধরে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের চোর বলে অভিহিত করে আসছে।' হোসেন জিল্লুর রহমান আরও ভালো উদাহরণ দেন। তিনি বলেন, 'যারা ঋণখেলাপি তাদের গালিগালাজ করার রেওয়াজ গড়ে ওঠেনি। কিন্তু চেয়ারম্যান-মেম্বারদের গালিগালাজে আমরা সিদ্ধহস্ত। তারা জনগণের কাছাকাছি থাকে বলে আমলারা তাদের জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়। ব্যাংক খেলাপিরা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন কিন্তু আমলা আর রাজনীতিবিদদের সঙ্গে সুসম্পর্ক তাদের। জনগণের টাকা মেরে বিলাসী জীবন যাপন করবে এক পক্ষ, অন্যদিকে দেশকে এগিয়ে নিতে যারা পরিশ্রম করছে তাদেরকে গণহারে চোর, বদমায়েশ বলে অভিহিত করছি। হয়তো আরও দুতিন দশক লাগবে এটা ঠিক হতে।' বাংলাদেশের উন্নয়নের পথে সবচেয়ে বড় বাধা আমলা আর তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নব্য ধনী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। যাদের কোনো রাজনৈতিক পরিচয় নেই। শুধু টাকার জোরে নমিনেশন কিনে সংসদে আসছে।

স্থানীয় সরকারের ইমেজ সংকটের জন্য মিডিয়াও কমবেশি দায়ী। কারণ বাংলাদেশের সিনেমা বা নাটকে খারাপ চরিত্র মানেই চেয়ারম্যান বা মেম্বার। সম্ভবত এমন কোনো চরিত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেখানে চেয়ারম্যান বা মেম্বারকে ভালো মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। মিডিয়ার লাগামহীন নেতিবাচক প্রচারণা স্থানীয় সরকারের ইমেজকে শূন্যের কোঠায় এনেছে। অবশ্য চেয়ারম্যান যারা হন, এই পরিচয় তাদের সামনে অনেক সম্ভাবনার দ্বার

খুলে দেয়। ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে শুরু করে অনেক ক্ষেত্রে তার প্রবেশাধিকার বাড়ে। এটাও একটি ভাবনার বিষয়।

ইমেজের যখন এই অবস্থা তখনই দৃশ্যপটে হাজির হচ্ছে কাশেম বা শহীদ চেয়ারম্যানদের কাহিনী। এসব চেয়ারম্যানদের কথা মিডিয়াতে আসায় স্থানীয় সরকার কোনোভাবেই ইমেজ সংকট কাটিয়ে উঠতে পারছে না। পাশাপাশি দৃষ্টান্ত সৃষ্টিকারী অনেক চেয়ারম্যান-মেম্বার আছেন। তারা মিডিয়ায় অনুপস্থিত। সমস্যা হলো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে জনগণের আস্থায় আসতে পারছে না। দারিদ্র্য আর দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাওয়ায় তার প্রভাব পড়ছে। স্থানীয় সরকারকে এখান থেকে উত্তরণের জন্য সরকারি পর্যায়ে কোনো উদ্যোগ আছে বলে জানা যায় না। একটি স্টাডি এর মধ্যেও আশার আলো জাগাচ্ছে। গত নির্বাচনে প্রায় ৪২ শতাংশ শিক্ষিত ও ভালো নেতৃত্ব স্থানীয় সরকারে নির্বাচিত হয়ে এসেছে। এর মধ্যে ২৫ শতাংশ উচ্চশিক্ষিত ও তরুণ নেতৃত্ব রয়েছে। এ সকল নেতৃত্ব দেশকে সামনের দিকে নিয়ে যাবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। ইউনিয়ন পরিষদ ফোরামের সভাপতি গোলাম সরোয়ার বলেন, 'আমাদের গম চোর বলে গালি দেন। আপনি কি জানেন কত ইউপি সদস্যের না খেয়ে দিন কাটে। কত জনের পারিবারিক অবস্থা করুণ। আমলারা আমাদের দুর্নীতির মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের কোনো দোষ হয় না। আমলারা কেউ ধরা পড়ে না। ডিসি এসপিদের খোঁজ নেন। তাদের ছেলে-মেয়েরা বিদেশে পড়ে, কোটি কোটি টাকা খরচ করে বাড়ি-গাড়ি বানায়। এই টাকা কোথা থেকে আসে? সব দোষ আমাদের উপরে চাপিয়ে লাভ নেই। আমলারা সবচেয়ে খারাপ। এতো সমস্যার মধ্যেও আমরা যে কাজ করে যাচ্ছি, এজন্য ধন্যবাদ পাওয়া উচিত।'

উত্তরণের পথ মাথায় আছে, বাস্তবে নেই

স্থানীয় সরকারকে দিয়ে সরকার কি করতে চায় সেটাও পরিষ্কার হওয়া দরকার। এজন্য চাই স্থানীয় সরকার বিষয়ক স্বচ্ছ আইন। অন্যদিকে স্থানীয় সরকারের অন্য যেসব কাঠামো আছে সেগুলোকে কার্যকরী করতে হবে। উপজেলা ও জেলা পরিষদ নির্বাচন দিতে হবে। যদিও টিএনও, ডিসি এসপিরা উপজেলা ও জেলা পরিষদ নির্বাচনের বিপক্ষে। কিন্তু স্থানীয় সরকারের এই দুটি স্তরকে কার্যকর করা সম্ভব হলে কেন্দ্রীয় সরকারের কাজ অনেক কমে যাবে। ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশে এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান এবং রাজনীতিবিদরা স্থানীয় সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকারের বর্ধিত অংশে পরিণত করেছে। স্থানীয় সরকার কখনো কেন্দ্রীয় সরকারের বর্ধিত অংশ হতে পারে না। স্থানীয় সরকারের জন্য প্রয়োজন স্বাধীনতা আর স্বায়ত্তশাসন।

আওয়ামী লীগ আমলে উপজেলা নির্বাচন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা চললেও ৮ বছরে এ কাজটি কেউ করেনি। করেনি না বলে বলা উচিত করতে আগ্রহী নয়। একটা ছোট উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়। যেমন, ইউপি চেয়ারম্যানরা টিএনওকে 'স্যার' বলে সম্বোধন করেন। উপজেলা চেয়ারম্যানদের টিএনও 'স্যার' বলে সম্বোধন করতো। টিএনওরা কোনোভাবেই চান না এলাকায় তার চেয়ে সুপিরিয়র কেউ হোক। তাছাড়া নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আমলাকে কেন স্যার বলে সম্বোধন করবেন? ড. আতিউর রহমান ও ড. আমিরুল ইসলাম চৌধুরী ব্যাপারটিকে অত্যন্ত খারাপ নজির বলে অভিহিত করেন। আমলারা সব সময়ই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অধীনে কাজ করবে। এটাই হওয়া উচিত। এ বিষয়ে সরকারকে গুরুত্বসহকারে ভাবতে হবে।

প্রতি জেলায় ADLG বলে একটা বিভাগ আছে। তাদের কাজ হলো প্রতিটি ইউনিয়ন ঘুরে ঘুরে কাজের তদারকি করবে। কিন্তু সব জেলায় এই পোস্ট নেই। আবার ইউনিয়ন পরিষদগুলোতে অডিট করার কথা থাকলেও সেটাও ঠিকমতো হয় না। জাতীয় রাজনীতি দুর্বৃত্তায়নের চক্রে ঘুরপাক খাচ্ছে, কিন্তু স্থানীয় সরকার এখনো এতোটা খারাপ পর্যায়ে যায়নি। ড. সালাহউদ্দিন আমিনুজ্জামান বলেন, 'বিদেশীরা চুরি করে না। কারণ তাদের সুযোগ নেই। আর এখানে নিয়মটাই এমনভাবে করা যাতে তারা দুর্নীতি করতে পারে।' ড. আতিউর রহমান বলেন, 'স্থানীয় সরকারকে শুধু মুখে কাজ করার সুযোগ দিলে চলবে না। তাদের আয়ের পথ সংকুচিত করে ফেলা হয়েছে। আগে তারা ট্যাক্স আদায় করতো, হাটবাজার লিজ দিতে পারতো। কিন্তু সরকার তাদের এই ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে। এইগুলো ফিরিয়ে দিতে হবে। এর সঙ্গে স্থানীয়ভাবে সিভিল সোসাইটি, এনজিও এবং জনগণকে কাজে লাগাতে হবে, তাহলে রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ সুপ্রতিষ্ঠিত হতে বাধ্য।'

স্থানীয় সরকার যেহেতু এখনো কার্যকর তাই আশাবাদী হবার অনেক কারণ আছে। তাদের দুর্বৃত্তায়নের দিকে ঠেলে না দিয়ে উন্নয়নের দিকে নিয়ে যেতে হবে। মাথায় আর কাগজে পরিকল্পনা থাকলে হবে না। সেটা বাস্তবায়ন করা জরুরি।

প্রয়োজন নির্বাচনী আইন সংস্কার

এমপিরা তাদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বাড়ানোর জন্য খারাপ লোকদের ইউপিতে নিয়ে আসছেন। যে সমস্ত খারাপ চেয়ারম্যান বা মেম্বারের নাম শোনা যায়, তাদের প্রত্যেকেরই একজন করে রাজনৈতিক গডফাদার আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব গডফাদার হলো ক্ষমতাসীন দলের এমপি বা তাদের লোকজন। এ ক্ষেত্রে এমন একটি নির্বাচনী পদ্ধতি দাঁড় করানো দরকার যাতে সন্ত্রাসী বা দুর্নাম আছে এমন লোকজন নির্বাচন করতে না পারে। নির্বাচনী ব্যয়ের ক্ষেত্রেও বিশাল একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন রয়ে গেছে। নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত নির্বাচনী ব্যয়ের যে সীমা নির্ধারণ করে দেয় সেটি অবাস্তব। কারণ জাতীয় নির্বাচনে ৫ লাখ টাকার সীমা থাকলেও প্রার্থীরা কোটি টাকা ব্যয় করেন। সবচেয়ে গরিব যে প্রার্থী তারও নির্বাচনে ২৫ লাখ টাকার উপরে ব্যয় হয়। ইউপি নির্বাচনে একজন প্রার্থী ৬-৭ লাখ টাকা ব্যয় করেন। অন্যদিকে ভোট কেনার যে ব্যাপার আছে সেখানেও নজর দিতে হবে। কোরআন শরিফের মধ্যে টাকা রেখে শপথ করিয়ে ভোট নেয়ার কালচার দেশে এখনো প্রতিষ্ঠিত। এর কারণ দুর্বল নির্বাচনী আইন। এ দেশে ইউপি নির্বাচন হলো উৎসব। এটাকে গণতান্ত্রিক আপিলের জায়গায় নিয়ে আসতে হবে। জানিপপের চেয়ারম্যান বলেন, 'নির্বাচনের পর কমিশনে একটি রিটার্ন দাখিল করতে হয়। কেউ খরচের সত্য হিসাব দেয় না। কারণ সত্য কথা বললে তার প্রার্থিতা বাতিল হয়ে যাবে। তার হাত-পা বাঁধা। তার মানে হলো, সে পার্লামেন্ট বা ইউপিতে আসছেই মিথ্যা কথা বলে। এই জায়গায় স্বচ্ছ হতে হবে। নির্বাচন কমিশনকে বাস্তবসম্মত ব্যয় সীমা নির্ধারণ করতে হবে। অন্যদিকে রিটার্ন দাখিল করার পর টাকার উৎসও জানতে চাইবে কমিশন।' তিনি আরও বলেন, 'স্থানীয় সরকারের নির্বাচন বিষয়ে সংবিধানে পরিষ্কার করে কিছু বলা নাই। ফলে মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকারে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পাচ্ছে।'

শুধু ইউপি নির্বাচন নয়, উপজেলা, জেলা পরিষদকে কার্যকর করার জন্য দ্রুত নির্বাচন দেয়া উচিত। 'স্থানীয় সরকার নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোনোভাবেই যেন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ প্রচার-প্রচারণা ও হস্তক্ষেপ করতে না পারে সে বিষয়েও কঠোর আইন হওয়া উচিত।' -বিশেষজ্ঞরা এই অভিমত দেন।

ইউপি হলো গণতন্ত্রের প্রথম ও প্রধান ধাপ। ইউনিয়ন পরিষদে যতটা দুর্বৃত্তায়ন হয়েছে তারচেয়ে অনেক বেশি দুর্বৃত্তদের দখলে চলে গেছে। এই দুর্বৃত্ত যেমন রাজনৈতিক, তেমনি প্রশাসনিকও। এই দুর্বৃত্তদের হাত থেকে স্থানীয় সরকারকে মুক্ত করতে পারলেই রাষ্ট্র উন্নয়নের পথে ধাবিত হবে, নতুবা নয়।

> স্থানীয় সরকারের ইমেজ সংকটের জন্য মিডিয়াও কমবেশি দায়ী। কারণ বাংলাদেশের সিনেমা বা নাটকে খারাপ চরিত্র মানেই চেয়ারম্যান বা মেম্বার। সম্ভবত এমন কোনো চরিত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেখানে চেয়ারম্যান বা মেম্বারকে ভালো মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।